সীমায় প্রকাশ

'সীমার মাঝে, অসীম, তুমি বাজাও আপন সুর'

সীমায় প্রকাশ (১২১ সংখ্যক গান) : পরম অসীমকে কবি নিজের মধ্যে উপলব্ধি করেছেন

❑ **উৎস ও রচনাকাল :** 'গীতাঞ্জলী' কাব্যের বিখ্যাত কবিতা এটি। কবিতাটি কবি ১৩১৭ বঙ্গাব্দের ২৭ আষাঢ় জানিপুর, গোরাই-এ রচনা করেন।

❑ **কাব্যকথা :** 'খেয়া'-র জগতে রবীন্দ্রনাথ যে আধ্যাত্মিক চিত্তলোকে চলে যাবার স্বপ্ন দেখেছেন তার পূর্ণতা ঘটেছে 'গীতাঞ্জলি'র যুগে। 'গীতাঞ্জলি'তে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, দুঃখের আঘাতেই জীবনের সার্থকতা আসবে। দুঃখ-বেদনাকে জয় করতে পারলেই পরম পুরুষের দেখা মেলে। 'গীতাঞ্জলি' কাব্যের ইংরেজি অনুবাদ নিয়ে কবি বিদেশ গিয়েছিলেন। সেইসব অনুবাদ পড়ে ইয়েটস এজরা পাউণ্ড প্রভৃতি কবিরা মুগ্ধ হয়ে গিয়েছিলেন। রবীন্দ্রনাথের আধ্যাত্মিক আকাঙ্ক্ষার উৎকৃষ্ট প্রকাশ লক্ষ্য করা যায় এই কাব্যে। 'গীতাঞ্জলি'র ইংরেজি অনুবাদ 'Song Offerings'-এর জন্য ১৯১৩ খ্রিস্টাব্দে রবীন্দ্রনাথ নোবেল পুরস্কার লাভ করেন। 'গীতাঞ্জলি'র ইংরেজি অনুবাদ পড়ে ইয়েটস এজরা পাউণ্ড প্রভৃতি কবিরা মুগ্ধ হন। ইন্ডিয়া সোসাইটি 'গীতাঞ্জলি'র ইংরেজি অনূদিত কবিতাগুলি প্রকাশ করে। এতে আছে গীতাঞ্জলির ৫১টি, গীতিমাল্যের ১৮টি, নৈবেদ্যের ১৬টি, খেয়ার ১১টি, শিশুর ১৩টি এবং চৈতালি, স্মরণ, কল্পনা, উৎসর্গ, অচলায়তনের ১টি করে মোট ১০৩টি কবিতা। ১৯১২ খ্রিস্টাব্দের ১ নভেম্বর লন্ডনের ইন্ডিয়া সোসাইটি ইয়েটসের ভূমিকা ও রোটেনস্টাইলের আঁকা রবীন্দ্রনাথের ছবিসহ কাব্যটি প্রকাশ করেন। ১৯১৩ খ্রিস্টাব্দের মার্চ মাসে ম্যাকমিলান কোম্পানী কাব্যটি প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে বিশ্বে সাড়া পড়ে যায়। নোবেল কমিটির সভাপতি হেরাণ্ড হারনে বলেন, 'গীতিকবিতায় এমন উচ্চতর সুর আর কখনো শোনা যায়নি।'

১৩১৭ বঙ্গাব্দের ভাদ্রমাসে প্রকাশিত 'গীতাঞ্জলি' কাব্যের ভূমিকায় রবীন্দ্রনাথ জানিয়েছেন 'এই গ্রন্থের প্রথম কয়েকটি গান পূর্বে অন্য দুই একটি পুস্তকে প্রকাশিত হইয়াছে। কিন্তু অল্প সময়ের ব্যবধানে যে সমস্ত গান পরে পরে রচিত হইয়াছে তাহাদের পরস্পরের মধ্যে একটি ভাবের ঐক্য থাকা সম্ভবপর মনে করিয়া তাহাদের সকলগুলিই এই পুস্তকে একত্রে বাহির করা হইল।'

'গীতাঞ্জলি'তে ১৫৭টি গান সংকলিত হয়েছে। 'সঞ্চয়িতা'য় স্থান পেয়েছে 'আত্মপ্রাণ', 'আষাঢ়সন্ধ্যা', 'বেলাশেষে', 'অরূপরতন', 'স্বপ্নে', 'সহযাত্রী', 'বর্ষার রূপ', 'প্রতিসৃষ্টি', 'ভারততীর্থ', 'দীনের সঙ্গী, 'অপমানিত', 'ধূলামন্দির', 'সীমায় প্রকাশ', 'যাবার দিন', 'অসমাপ্ত', 'শেষ নমস্কার' ইত্যাদি কবিতা। 'আত্মত্রাণ' কবিতায় কবি প্রার্থনা করেছেন—

'বিপদে মোরে রক্ষা করো, এ নহে মোর প্রার্থনা
বিপদে আমি না যেন করি ভয়।
দুঃখ তাপে ব্যথিত চিতে নাই বা দিলে সান্ত্বনা,
দুঃখে যেন করিতে পারি জয়।'

✪ মূল কবিতা পাঠ ✪

সীমার মাঝে, অসীম, তুমি
বাজাও আপন সুর।
আমার মধ্যে তোমার প্রকাশ
তাই এত মধুর।

কত বর্ণে কত গন্ধে
কত গানে কত ছন্দে,
অরূপ, তোমার রূপের লীলায়
জাগে হৃদয়পুর।
আমার মধ্যে তোমার শোভা
এমন সুমধুর।

তোমায় আমায় মিলন হলে
সকলই যায় খুলে—
বিশ্বসাগর ঢেউ খেলায়ে
উঠে তখন দুলে।
তোমার আলোয় নাই তো ছায়া
আমার মাঝে পায় সে কায়া—
হয় সে আমার অশ্রুজলে
সুন্দর বিধুর।
আমার মধ্যে তোমার শোভা
এমন সুমধুর।

গোরাই। জানিপুর
২৭ আষাঢ় ১৩১৭

✪ কবিতার বিষয়বস্তু ✪

কবি উপলব্ধি করেছেন, সীমার মধ্যে অসীমের সুর প্রতিনিয়ত বেজে চলেছে। সেজন্য কবির মধ্যে অসীমের প্রকাশ এত মধুময়। বিচিত্র বর্ণে গন্ধে গানে ছন্দে অরূপের রূপের লীলা হৃদয়পুরে জেগে ওঠে। তাই কবির মধ্যে অসীমের শোভা এত সুমধুর।

সসীম ও অসীমের মিলনে বিশ্বপ্রকৃতির সমস্ত কিছু উৎফুল্লিত হয়ে ওঠে। সীমায় প্রকাশের মধ্যেই অসীমের সার্থকতা। অসীমের আলোয় ছায়া নেই, সীমার মধ্যেই যে কায়া লাভ করে। সসীমের সুখ-দুঃখ, হাসি-কান্নার মধ্যে তার শোভা সুন্দর ও মধুময় হয়ে ওঠে।

✪ রসগ্রাহী আলোচনা ✪

অসীম অনন্ত, তাকে বাধা যায় না। অপরদিকে সসীম বন্ধ। মানুষের মন মানুষকে যেমন বন্ধনমুখী করে, তেমন আবার মোক্ষমুখী করে। মন স্থূল বিষয়ের মধ্যে আবদ্ধ থাকলে তখন তা হয় বন্ধনের কারণ, অপরদিকে সূক্ষ্ম চিন্তা করলে অসীম ও অনন্তের অভিমুখী হয়। হাত দিয়ে যেমন স্থূল বস্তুকে ধরা যায় মন দিয়ে তেমন সূক্ষ্ম বস্তুকে ধরা যায়। জগতের সব কিছু চলেছে লক্ষ্য বস্তুর দিকে, অপরিদকে যিনি অসীম অনন্ত, তাঁর কোনো লক্ষ্য নেই ; তিনি হলেন নিজেই স্বয়ংসম্পূর্ণ। নদীর লক্ষ্য যেমন সাগর, সমীম তেমন অসীম অনন্ত অভিমুখী। সসীম জগতের স্থূল কামনা বাসনা অনেক সময় অসীমের পথে বাধা প্রদান করে। রবীন্দ্রনাথ বৃহৎ বা অনন্তের আকর্ষণে সর্বদা ধরা দিয়েছেন। অমৃতের সন্তান মানুষ যেখান থেকে আসে দীর্ঘদিন পরে আবার সেখানে ফিরে যায়। বিষয়মুখী বন্ধ জীবন হল বিষবৎ। সৃষ্টির নিয়মের সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলা হল মানবজীবন। মন যখন উর্ধ্বপানে ছোটে তখন তা হয় অসীমের অভিমুখী, যখন নিম্নাভিমুখে ছোটে

তখন জাগতিক বস্তুসত্ত্বা তাকে আকর্ষণ করে। মূলাধার, স্বাধিষ্ঠান, মণিপুর, অনাহত, বিশুদ্ধ, আজ্ঞা মানবদেহের ষড়চক্রে ধর্ম, অর্থ, কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, ঈর্ষা ইত্যাদি বৃত্তিগুলো অবস্থান করে। এইসব বৃত্তির প্রভাবে মন কখনও বৃহৎ হয় কখনও আবার ক্ষুদ্র হয়। বৃহৎ মন মানুষকে অসীমের অভিমুখী করে। জগতের ধর্ম হল গতিশীলতা এবং পরিবর্তনশীলতা। জগতের কোথাও কিছু স্থির নেই—পরিবর্তনের লীলাখেলা সর্বত্র প্রতিনিয়ত চলছে। এই পরিবর্তশীলতাকে বিজ্ঞান বলেছে 'আপেক্ষিক সত্য'। এখন যাকে সত্য বলে মনে হয়, পরে তা বদলে যায়। তাই চরম সত্য বাস্তব জগতে কিছু নেই, সবই আপেক্ষিক সত্য। স্বামী বিবেকানন্দ বলেছেন, 'আমরা নিম্নতর সত্য থেকে ক্রমশঃ উচ্চতর সত্যে আরোহণ করে থাকি। মানবজীবনের চরম লক্ষ্য হল চরম সত্যকে জানা। প্রকৃতি সৃষ্ট মানুষের স্বভাবধর্ম হল অনন্তের অভিমুখী হওয়া। ভোগ্যবস্তুতে চাহিদার পরিতৃপ্তি সাধন হয় না। অনন্তের অভিমুখী হওয়ার মধ্যেই আছে মানুষের অনন্ত চাহিদার পরিতৃপ্তি সাধন। মানবমন অনন্তের অভিমুখে এগিয়ে গিয়ে সর্বদা সুখ লাভ করতে চায়। 'নাল্পে সুখমস্তি ভূমৈব সুখম্' বিষয়ভোগে সুখ নেই, ভূমার সঙ্গে মিলনের মধ্যে আছে পূর্ণ সুখ। ভূমাকে জানলেই মানবমনের অনন্ত চাহিদার অবসান ঘটে। অসীম বা অনন্তকে যথাযথভাবে দেখতে পাই না, ভাবতে পারি। সেই ভাবা হল উপাসনা। উপাসক উপাসনার মাধ্যমে সেই সত্যকে লাভ করতে পারেন। যখন সেই সত্য লাভ করা সম্ভব হয় তখনই বলা সম্ভব হয়—

'সীমার মাঝে, অসীম, তুমি বাজাও আপন সুর।
আমার মধ্যে তোমার প্রকাশ তাই এত মধুর।
কত বর্ণে কত গন্ধে, কত গানে কত ছন্দে।
অরূপ, তোমার রূপের লীলায় জাগে হৃদয়-পুর—
আমার মধ্যে তোমার শোভা এমন সুমধুর।।'

মানবিক সমস্ত বৃত্তিগুলি অনন্ত অভিমুখী হওয়াতেই এমন কথা বলা সম্ভব হয়েছে। বৈষ্ণব কবি গেয়েছেন—

'ঘর কৈনু বাহির বাহির কৈনু ঘর
পর কৈনু আপন আপন কৈনু পর—'

অন্ধকার থেকে আলোকের যাত্রাপথের দীপশিখা তখন জ্বলে ওঠে। জীবজগৎ ও প্রকৃতি জগতের সব কিছু তখন আলোকময় হয়ে ওঠে। সে আলোর অনির্বচনীয় ব্যঞ্জনা রামধনুর সাত রঙের মতো ধূলি-মলিন পৃথিবীর সীমা থেকে সীমাহীন সুদূর ভাবলোক পর্যন্ত বিস্তৃত হয়ে থাকে। সেখানে সৃষ্টি থেকে ধ্বংস পর্যন্ত সব কিছুর মধ্যে চলে আনন্দের প্লাবন। অন্তরালোকচারী সঙ্গীতের ডালি নিয়ে আঁধার ঘরের 'মন' ধ্যান গম্ভীর পরিবেশে আলোকের পাখি হয়ে আবির্ভূত হয়। তখন স্বপ্নমগ্ন সৌন্দর্যশয্যায় সুপ্তিভঙ্গের গান ঘুরে ফিরে বাজে। রবীন্দ্রনাথের 'রাজা' নাটকে দেখা যায়, 'অন্ধকারের রাজা'কে রানী সুদর্শনা বীভৎস মনে করেছেন, অথচ সেই বীভৎসতা সরে গেলে সুন্দরের প্রকাশ হয়েছে। রাজার ধ্বজায় ছিলে 'পদ্মফুলের মাঝখানে বজ্র আঁকা'। আমাদের প্রত্যেকের মধ্যেই তো চলে সেই কোমলে-কঠিনে সংঘাত। সেই সংঘাতের মাঝেই আসতে হয় রাজাকে, রাজার রাজাকে। তখন 'তিনি' জীবনের বন্ধু হয়ে সসীমের যাত্রীকে পথ দেখিয়ে অসীমের অভিমুখে নিয়ে যান। তখন 'তিনি' আলো-আকাশ-মুক্তির গান শোনান—

'তোমায় আমায় মিলন হলে সকলই যায় খুলে
বিশ্বসাগর ঢেউ খেলায়ে উঠে তখন দুলে।
তোমার আলোয় নাই তো ছায়া,
আমার মাঝে পায় সে কায়া,

হয় সে আমার অশ্রুজলে সুন্দর বিধুর—
আমার মধ্যে তোমার শোভা এমন সুমধুর।'

চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, 'ভূমা এক দিকে সগুণ ; তিনি এক হইয়াও গুরুত্বপূর্ণ জগতের আধার। একই আপনাকে বহুরূপে বিভক্ত করিয়া বহুর মধ্যে অনুস্যূত থাকিয়া বহুকে একসূত্রে ধারণ করিয়া আছেন সূত্রে মণিগণা ইব। এই অনন্তের সুর সান্তের মধ্যে বাজে বলিয়া আমরা অনুভব করিতে পারি যে আমরা বন্ধ জীব নই, আমাদেরও মুক্তি আছে, আমরা অমৃতস্য্য পুত্রাঃ অ-মৃত। এই বৃহত্তর আনন্দের দিক্‌টা যাঁহার জীবনে যত বেশি প্রকাশ পাইয়াছে তাঁহার মানবজন্ম তত বেশি সার্থক হইয়াছে। আমাদের কবি ঋষি, তাঁহার জীবনের এই সার্থকতা লাভ করিয়াছে।'

(রবি রশ্মি)

ভূমা ও ভূমির মিলেন বিশ্বজগৎ হেসে ওঠে, প্রকৃতিতে ও মানবমনে জেগে ওঠে আনন্দধ্বনি। তখন অরূপের রূপের লীলা উপলব্ধি করা যায়।

'আহার নিদ্রা ভয় মৈথুনঞ্চ সামান্যমেতদ্‌পশুভির্নরাণাম্।
ধর্ম্মোহি তেষামধিকো বিশেষো ধর্ম্মেণ হীনাঃ পশুভিঃ সমানাঃ।।'

পশুর জীবনের থেকে মানুষের জীবনের পার্থক্য আছে। বৃহতের আহ্বান মানুষের কর্ণকুহরে প্রতিনিয়ত ধাক্কা মেরে চলেছে—'ডেকেছেন প্রিয়তম কে রহিবে ঘরে'। মানুষের প্রতিটি অংশ সেই ডাকে স্পন্দিত হচ্ছে, মানুষ জড়ের তো বন্ধ ঘরে বসে থাকবে কি করে? সমস্ত বাধা সমস্ত অন্ধকার ভেদ করে মানুষকে এগিয়ে যেতে হবে। অসীমের অভিসার তো সেখানেই সম্পূর্ণ হবে। তখনই তো নিজেকে যথার্থভাবে দেখা ও চেনা সম্ভব হবে। অজানা পথিক তখনই তো আলো ঢেলে সব অন্ধকার কুটির ধুইয়ে দিয়ে যাবে।

'তাঁর' দীপ্তি ও কান্তি সর্বভূতে বিরাজমানা। অসীমের আলোক চ্যানেলে বিরাজ করে 'বরাভয় মুদ্রা'। সে মুদ্রা থেকে প্রতিনিয়ত ছুটে আসছে অসীমের ডাক—অভীমন্ত্র। সেই অন্বয় অনুভূতির মিলনানন্দে অসীমকেও সসীমের মহা-পরিক্রমায় বের হতে হয়। বৈষ্ণব কবি চণ্ডীদাসের এক অভিসার পর্যায়ের পদে দেখি পরম পুরুষ গাঢ় অন্ধকার মেঘ ও বৃষ্টি মাথায় নিয়ে পথ হেঁটে এসে ভক্তের আঙিনায় দাঁড়িয়ে ভিজছেন। ভক্ত এই দৃশ্য দেখতে দেখতে পুলকিত হচ্ছেন, বিস্মিত হচ্ছেন, শিহরিত হচ্ছেন, দুঃখীত হচ্ছেন, আনন্দিত হচ্ছেন—

'এ ঘোর রজনী মেঘের ঘটা
কেমনে আইল বাটে।
আঙ্গিনার মাঝে বঁধুয়া তিতিছে
দেখিয়া পরাণ ফাটে।।'

সুষুপ্তি জাগরণে প্রতিমুহূর্তে ভূমা ভূমির ঘরকে আলোকিত করে চলেছে। সীমার মাঝে অসীম তখন খেলা করে বেড়ায়। অরূপে ছিলেন তিনি, রূপে এসেছেন। রূপের আলোকে অরূপ ধরা দেন। রূপ ও অরূপের, সসীম ও অসীমের লীলা চলে সর্বদা। সে লীলায় থাকে বেগ, গতি, দীপ্তি। সেই অনুপমা দীপ্তি প্রকৃতিতে প্লাবন তুলে বিশ্বকে করে তোলে মহাবিশ্ব। আমাদের 'ছোটো ঘর'টা তখন পরিণত হয় 'বড় ঘরে'। সেখানে মানুষ-পশু, উঁচু-নিচু, নারী-পুরুষ, মেঘ-বৃষ্টি, পাহাড়-জঙ্গল, ফুল-পাখি, সূর্য-চন্দ্র সব মিলে মিশে এক হয়ে যায়। তখন নন্দন বনের চন্দন শোভা আর ধরণীর ধূলিকণা এক বলে মনে হয়। উপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য বলেছেন, 'মানুষের মধ্যে এই দুইটি বিভিন্ন সত্তার মিলনই কাম্য ইহাই তাহার সার্থকতার রূপ—সান্তের মধ্যে অনন্তের অভিব্যক্তি। এই দুইটি রূপ পরস্পর আপেক্ষিক। আমাদের মধ্যকার যে মুক্ত, স্বাধীন অংশ, তাহার সার্থকতাই হয় এই বন্ধ অংশের সহিত মিলনে, না হইলে উহা একটা বায়বীয় ভাব বা আদর্শমাত্র। সংসারের বহু

ঊর্ধ্বে অন্তরীক্ষচারী একটি অবস্থা, আবার আমাদের বন্ধ অংশ কেবল জড়, কদর্য বস্তুপিণ্ডে পর্যবসিত হয়, যদি মুক্ত হাওয়ার দ্বারা, বৃহৎ ভাবের দ্বারা, এই বৃহত্তর অংশের দ্বারা, ইহার শুদ্ধি ক্রিয়া সম্পন্ন না হয়। ইহা যেন অনেকটা সেই সাংখ্যের প্রকৃতি পুরুষবাদ। পুরুষ নিত্যশুদ্ধ, মুক্ত, অনাসক্ত ; প্রকৃতি জড়ময়ী, কিন্তু এই পুরুষকে উপলক্ষ্য করিয়াই তাহার সৃষ্টিলীলা। এই নির্বাক, উদাসীন, সাক্ষীটা না থাকিলে তাহার সমস্ত সৃষ্টিকার্য রুদ্ধ। সে বন্ধ্যা।' (রবীন্দ্রকাব্য-পরিক্রমা)

✪ 'সীমার মাঝে অসীম' ✪

- সসীম ও অসীমের মেলবন্ধন।
- 'অরূপ, তোমার রূপের লীলায় জাগে হৃদয়পুর—'
- অসীমের সীমায় প্রকাশ।

আধ্যাত্মিকবাদীরা মনে করেন জীবজগতের সমস্ত কিছু পরম পুরুষের পূর্ণানন্দের আশ্রয়। চিরকাল প্রকৃতি পুরুষের পিছনে ছুটছে এবং পুরুষ প্রকৃতিতে আকর্ষণ করছে। ব্যক্ত ও অব্যক্তের এই চিরন্তন লীলা হল পুরুষ প্রকৃতির লীলা। অব্যক্তকে ধারণা করে নিতে হয়, কিন্তু সেই অব্যক্ত যখন ব্যক্ত হন তখন তাকে আমরা উপলব্ধি করতে পারি। একদিকে পরম পুরুষ অন্যদিকে তাঁর সৃষ্টি বিশ্বপ্রকৃতি। এই বিশ্বপ্রকৃতি তথা সৃষ্টির সঙ্গে পরম পুরুষের চলে নিত্য আদান-প্রদান। রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, 'অসীমকে সীমার মধ্যে আনিয়া ভক্ত তাহাকে উপলব্ধি করিয়াছেন। আকাশ যেমন গৃহের মধ্যে আবদ্ধ হইয়াও অসীম এবং আকাশই সেইরূপ রাধাকৃষ্ণের মধ্যে পরিচ্ছন্ন হইয়াও অসীম ব্রহ্ম ব্রহ্মই আছেন। মানবমনে অসীমের সার্থকতা সীমার বন্ধনে আসিয়া। তাহার মধ্যে আসিলেই অসীম প্রেমের বস্তু হয়। নতুবা প্রেমাস্বাদ সম্ভবই নয়। অসীমের মধ্যে সীমাও নাই। প্রেমও নাই। সঙ্গীহারা অসীম সীমার নিবিড় সঙ্গ লাভ করিতে চায় প্রেমের জন্য। ব্রহ্মের কৃষ্ণরূপ ও রাধারূপের মধ্যে এই তত্ত্বই নিহিত। অসীম ও সীমার মিলনের আনন্দই পদাবলীর রূপ ধরিয়াছে সৃষ্টিতে সার্থক হইয়াছে।' রূপ-রস-গন্ধের মাধ্যমে ছয় ঋতু বাঁশির ছটি ছিদ্রের মতোই প্রতিনিয়ত আমাদের আকর্ষণ করে চলেছে—'ডেকেছেন প্রিয়তম কে রহিবে ঘরে'। বিষয় বিষের কপাট এঁটে বসে থাকা মানুষ সহজে সেই ডাক শুনতে পান না। সাংসারিকতা সবরকম কপাটকে অর্থাৎ সীমার বন্ধনকে সরিয়ে আমরা অসীমের লীলায় যোগ দিতে চাই বটে, কিন্তু সে পথ কন্টকাকীর্ণ, সেখানে অনেক বাধা-বিপত্তি। ব্রহ্মের সৃষ্টি এই জগৎ সৎ, চিৎ ও আনন্দের সমাহার। তিনি একদিকে রস অন্যদিকে রসের আস্বাদক 'রসঃ বৈ সঃ'। 'তাঁর' চরমতম সৌন্দর্যের প্রকাশ হল মানুষ। 'তিনি' চেয়েছেন মানবতার আদর্শ কল্যাণমুখী হোক। 'তাঁর' ফুল, ফসল, আলো, বাতাস, আর কাজ নিয়ে মানুষ হেসে-খেলে বড় হোক। সমস্ত ভুবনকে আলোয় ভরিয়ে তোলাই তাঁর সাধনা।

জীবনশিল্পীর কাছে এই মহাবিশ্ব চিরকাল অনুসন্ধানের বিষয় হয়েছে। এই নিসর্গের সঙ্গে বিশ্ব-নিয়মের, বিশ্ব-নিয়মের সঙ্গে ব্যষ্টি ও সমষ্টি জীবনের, সসীমের সঙ্গে অসীমের সম্পর্কের যে রহস্য, সে রহস্য রোমান্টিক কবির কাছে কখনও 'আলোর পাখি' হয়ে উড়ে বেড়িয়েছে, কখনও হয়েছে 'আলোর গান', মিস্টিক শিল্পীর কাছে তা রূপান্তরিত হয়েছে 'আলোর দেবতা'য়। অসীমের সীমায় প্রকাশ ঘটেছে নানা তত্ত্বে রূপে-রসে। 'মানুষের ঈশ্বর' মানুষকে ত্যাগ করলে মানুষ তো আর মানুষ থাকে না। মানুষকে রক্ষা করতে, জীবজগৎ ও প্রকৃতিজগৎকে রক্ষা করতে 'তাঁকে' তখন নেমে আসতে হয় মাটির পৃথিবীতে। অসীমের প্রকাশ ঘটে সীমায়। মানবতাকে রক্ষা করতে, বিশ্বকে রক্ষা করতে, 'পরিত্রাণায় সাধুনাং' মন্ত্রকে সফল করতে মহামানবের আবির্ভাব ঘটে। আমরা যে অসীমের সঙ্গে জড়িয়ে আছি, যে অসীমের জন্য সসীমের আকুলতা, যা আমাদের অন্ধকার ঘরকে আলোকিত করে, যা সৃষ্টির রথের চাকাকে সচল রাখে, তা যখন পাপ-পঙ্কিলতায় অন্ধকার

কারাগৃহে ঘুরপাক খায়, তখন তা যে কালো পাপকে ধুয়েও সাদা করে দিয়ে যায়। তখন হিসাব মেলাতে হয় জীবনের দেনা-পাওনার। তখন ব্যথাভরা চিত্তে প্রত্যক্ষ করতে হয় সহস্র মায়া-মোহ বন্ধনে বন্দী আত্মকেন্দ্রিক সমাজের অর্থহীন অসাড়তা। তখন জীবনের সব বন্ধনকে পিছনে ফেলে সবরকম চাওয়া-পাওয়া ও হিসাব-নিকাশের বাইরে এসে হাঁটু গেড়ে বসতে হয় নিজের কাছে, নিজের দেবতার কাছে। বৈষ্ণব কবিও গেয়েছেন 'তুয়া বিনা গতি নাহি আরা'। তখন তাঁর উপাসনাই জীবনের সর্বশ্রেষ্ঠ কর্ম পরম ব্রত বলে মনে হয়। তখন মনে হয় মায়াপ্রপঞ্চময় কালো সমাজ জীবনের নাগপাশে বন্দী থেকে সারা হল না জীবনের পূজা। পৃথিবীতে চিরকাল জন্ম আছে, মৃত্যু আছে। অজস্র ধ্বংস সৃষ্টি নিয়ে মানবতার পথে সুস্থ পৃথিবী তৈরির জন্য চিরকাল মানুষকে এগিয়ে যেতে হয় সামনের দিকে। সমস্ত বাধা বন্ধনকে অস্বীকার করে অতীত থেকে মানুষ এগিয়ে চলে ভবিষ্যতের কালচক্রে। সুন্দর-প্রেম-শান্তি, সৃষ্টির মূল লক্ষ্য হল এই। এইসব নিয়ে বেঁচে থাকে মানবতা। মানবতা রক্ষার জন্য মানুষের পশু-পাখির, প্রকৃতির, সসীমের-অসীমের সব কিছুর সমান প্রয়োজন। জগতের যা কিছু অসুন্দর তাকে নির্মল ও পবিত্র করে নিয়ে চিরকালের মানব সামনের দিকে এগিয়ে চলে সবরকম বন্ধন ঠেলে। মানুষ সেখানে চিরকালের যাত্রী, মানব সেখানে চির অমর। মৃত্যুকে অতিক্রম করে নবসৃষ্টির নেশায় সে পাগল। সসীম-অসীমের মেলবন্ধনে মানবতা এগিয়ে চলে সামনের দিকে। রবীন্দ্রনাথ বলেছেন—

'সুর আপনারে ধরা দিতে চাহে ছন্দে,
ছন্দ ফিরিয়া ছুটে যেতে চায় সুরে
ভাব পেতে চায় রূপের মাঝারে অঙ্গ,
রূপ পেতে চায় ভাবের মাঝারে ছাড়া।
অসীম যে চায় সীমার নিবিড় সঙ্গ,
সীমা চায় হতে অসীমের মাঝে হারা।
প্রলয়ে সৃজনে না জানি একার যুক্তি,
ভাব হতে রূপে অবিরাম যাওয়া-আসা,
বন্ধ ফিরিছে খুঁজিয়া আপন মুক্তি,
মুক্তি মাগিছে বাঁধনের মাঝে বাসা।'

রবীন্দ্র কাব্যের মূল সুরই হল সসীমের সঙ্গে অসীমের মেলবন্ধন। সংসারে আবন্ধ জীবের প্রকৃতির মুক্তির আনন্দের প্রতি প্রবল আকর্ষণ থাকে। কিন্তু দৈনন্দিন বন্ধ জীবনের আবন্ধ থাকায় মুক্তির গান গাইতে পারে না। 'আধুনিক সাহিত্য' গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত 'বিহারীলাল' প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, 'আমাদের প্রকৃতির মধ্যে একটি বন্ধন অসহিষ্ণু স্বেচ্ছাবিহার প্রিয় পুরুষ এবং একটি গৃহবাসিনী অবরুদ্ধ রমণী দৃঢ় অবিচ্ছেদ্য বন্ধনে আবন্ধ হইয়া আছে। একজন জগতের সমস্ত নতুন নতুন দেশ ঘটে না এবং অবস্থার মধ্যে নব নব রসাস্বাদ করিয়া আপনি অমর শক্তিকে বিচিত্র বিপুলভাবে পরিপুষ্টি করিয়া তুলিবার জন্য সর্বদা ব্যাকুল। আর একজন সাত সহস্র অভ্যাসে বন্ধনে প্রথায় আচ্ছন্ন প্রচ্ছন্ন এবং পরিবেষ্টিত। একজন বাহিরের দিকে লইয়া যায়, আর অন্যজন গৃহের দিকে টানে।'

ঈশ্বর নিজের সৃষ্ট জীবের মধ্যে নিজেকে উপলব্ধি করে থাকেন। অপরদিকে জীব নিজেকে ঈশ্বর থেকে স্বতন্ত্র মনে করে বলেই উভয়ের বিরহ-মিলন এত আনন্দের। অসীমকে সীমার বন্ধনে না বাঁধা পর্যন্ত তাঁকে উপলব্ধি করা যায় না। বৈষ্ণবেরা ভগবান শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীরাধিকার অলৌকিক লীলাকে চৈতন্যদেবের মধ্যে প্রত্যক্ষ করেছেন। অসীমকে তাঁরা বেঁধেছেন সীমার বন্ধনে। অরূপ

হয়েছে রূপময়। শ্রীকৃষ্ণের নিজ রস আস্বাদনের স্বরূপ আলোচনা করতে গিয়ে কৃষ্ণদাস কবিরাজ 'শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত' গ্রন্থে আদি লীলায় লিখেছেন—

'রাধা কৃষ্ণ এক আত্মা দুই দেহ ধরি।
অন্যোন্যে বিলাসে রস আস্বাদন করি॥
সেই দুই এক এবে চৈতন্য গোসাঞি।
ভাব আস্বাদিতে দোঁহে হৈলা এক ঠাঁই॥'

শ্রীকৃষ্ণই চৈতন্যরূপে আবির্ভূত হয়েছেন বলে জানিয়েছেন বৃন্দাবন দাস। গীতায় বলা হয়েছে—

'যদা যদা হি ধর্মস্য গ্লানির্ভবতি ভারত।
অভ্যুত্থানধর্মস্য তদাত্মানং সৃজাম্যহম্॥
পরিত্রাণায় সাধুনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাম্।
ধর্মসংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে॥'

অধর্মের গ্লানি দূর করতে ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে বারে বারে এই মর্ত্যভূমিতে আবির্ভূত হতে হয়েছে। মানুষ এইভাবে বারে বারে অসীমকে সীমার বন্ধনে বেঁধেছেন। রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন—

'তোমায় আমায় মিলন হলে সকলই যায় খুলে—
বিশ্বসাগর ঢেউ খেলায়ে উঠে তখন দুলে।
তোমার আলোয় নাই তো ছায়া,
আমার মাঝে পায় সে কায়া,
হয় সে আমার অশ্রুজলে সুন্দর বিধুর—
আমার মধ্যে তোমার শোভা এমন সুমধুর॥'

কৃষ্ণের অভিসার খুঁজে পাই ; রবীন্দ্রনাথ তেমন 'গীতাঞ্জলী'র ৩৪ সংখ্যক কবিতায় সীমার সঙ্গে মিলনের জন্য অসীমের অভিসারের কথা বলেছেন—

'আমার মিলন লাগি তুমি
আসছ কবে থেকে।
তোমার চন্দ্র সূর্য তোমায়
রাখবে কোথায় ঢেকে॥'

৬৫ সংখ্যক কবিতায় আছে অসীমের উদ্দেশ্যে সীমার অভিসারের কথা। বৈষ্ণব পদাবলীর অভিসারের রাধিকা অসীমের যাত্রী, সমস্ত বন্ধনকে তিনি অবলীলায় তুচ্ছ করতে পেরেছেন। সীমার মধ্যে যখন সেই অসীম ধরা দেয় তখন সমস্ত ক্ষুদ্রগণ্ডি ভেঙে যায়। কবি উপলব্ধি করছেন, অসীম তাঁর মধ্যে ধরা দিয়েছে বলে জগতের সবকিছু তিনি মধুময় রূপে উপলব্ধি করেছেন—

'সীমার মাঝে, অসীম, তুমি বাজাও আপন সুর,
আমার মধ্যে তোমার প্রকাশ তাই এত মধুর।'